অরণ্যের ডাক

লেখা - ফিলিপ কে ডিক, ভাষান্তর: মুনির রানা

‘আচ্ছা, করপোরাল ওয়েস্টারবার্গ, বেশ শান্তভাবেই জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর হেনরি হ্যারিস, ‘ঠিক কেন আপনার মনে হচ্ছে যে আপনি একটা গাছ?’

কথাটা বলতে বলতেই টেবিলের ওপর রাখা কার্ডটার দিকে একবার চোখ বোলালেন তিনি। সরাসরি বেইজ কমান্ডারের কাছ থেকে এসেছে লোকটা। কমান্ডার কক্সের ভারী হাতের হিবিজিবি লেখা কার্ডটাতে—

ডক,

এই ছেলেটার কথাই বলেছিলাম আপনাকে। ওর সঙ্গে কথা বলুন। এই মতিভ্রম ওর কেন হলো, কিছুই বুঝতে পারছি না। ও আমার এখানে এসেছে নতুন গ্যারিসন থেকে। অ্যাস্টারয়েড ওয়াই থ্রিতে এই নতুন চেক স্টেশন। আমরা চাই না, ওখানে কোনো গোলমাল হোক। বিশেষ করে এ রকম তুচ্ছ বিষয় থেকে গোলযোগ কোনোভাবেই কাম্য নয়।

কার্ডটা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন হ্যারিস। তাকালেন সামনে বসা যুবকের দিকে। দেখে কিছুটা অসুস্থ মনে হচ্ছে। হ্যারিসের প্রশ্নে তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। উত্তর দেওয়ার কোনো রকম ইচ্ছা আছে বলে মনে হচ্ছে না। ভ্রুতে ভাঁজ পড়ল ডাক্তারের। ওয়েস্টারবার্গ দেখতে মন্দ নয়। পেট্রল ইউনিফর্মে তাকে সুদর্শনই লাগছে। ঝাঁকড়া সোনালি চুলের একটা গোছা এক চোখের ওপর ঝুলে আছে। ঝাড়া ৬ ফুট লম্বা, স্বাস্থ্যটাও দশাসই। ওর আইডি কার্ডের তথ্য অনুযায়ী ২ বছর প্রশিক্ষণ শেষ করেছে সে। ডেট্রয়েটে জন্ম। ৯ বছর বয়সে একবার হাম হয়েছিল। জেট ইঞ্জিনে আগ্রহ তুমুল। টেনিস খেলতে ভালোবাসে। নারীসঙ্গ উপভোগ করে। বয়স ২৬।

‘বলুন ওয়েস্টারবার্গ,’ আবার জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর হ্যারিস, ‘কেন এ রকমটা মনে হচ্ছে আপনার? কারণটা কী?’

এবার চোখ তুলে লাজুকভাবে তাকাল করপোরাল। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করল। ‘স্যার, আমি আসলেই একটা গাছ। এটা যে আমি মনে করি, তা নয়। আমি গাছই। কয়েক দিন ধরেই আমি গাছ।’

‘আচ্ছা। তার মানে আপনি সব সময় গাছ ছিলেন না? কিছুদিন আগে থেকে আপনার এটা মনে হচ্ছে?’

‘জি স্যার। এই অল্প কিছুদিন হলো আমি গাছ হয়ে গেছি।’

‘গাছ হওয়ার আগে আপনি কী ছিলেন?’

‘তখন স্যার আমি আপনাদের মতোই স্বাভাবিক মানুষ ছিলাম।’

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কলমটা হাতে নিয়ে অর্থহীন কয়েকটা আঁচড় কাটলেন হ্যারিস কাগজের ওপর। সাইকোলজিস্ট হওয়ার এই এক ফ্যাচাং। কত রকমের পেশেন্ট যে সামলাতে হয়। এর চেয়ে নাক-কান-গলার ডাক্তার হওয়াও ভালো ছিল। কিন্তু ডাক্তারিতে ভর্তি হওয়ার সময় মানুষের মনের গভীরে ডুব দেওয়ার নেশায় পেয়ে বসেছিল তাঁকে। তারই খেসারত দিয়ে যাচ্ছেন এখনও। ৬ ফুটের এক মানববৃক্ষের সঙ্গে কথা বলছেন।

এ রকম একটা স্বাস্থ্যবান ছেলে কিনা বলছে সে একটা গাছ! চশমাটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছলেন কাচ। আবার চোখে পরে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন।

‘সিগারেট খাবেন করপোরাল?’

‘না স্যার।’ ডাক্তার নিজেই একটা ধরালেন। চেয়ারের হাতলের ওপর সিগারেট ধরা হাতটা মেলে দিলেন। ছেলেটার মধ্যে একটা বিরুদ্ধভাব আছে, মনে হলো তার। আগে ওর মনটা নরম করে আনতে হবে, ভাবলেন তিনি। ‘করপোরাল। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে খুব, খুব অল্প মানুষই গাছ হতে পারে।’

একটু চমকে গিয়ে করপোরাল তাকালেন ডাক্তারের দিকে। চোখের তারায় একটু আনন্দ চকিতে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল। ‘খুব অল্প মানুষই গাছ হতে পারে’, কথাটা তাঁর মনে ধরেছে, বুঝলেন হ্যারিস। এটাই চেয়েছিলেন তিনি।

‘শোনেন, সত্যি–মিথ্যা জানি না, কিন্তু শুনেছি অতীতে অনেক মুনি–ঋষিরা নাকি বসে থেকে একনাগাড়ে অনেক দিন ধ্যান করতেন। বসে থাকতে থাকতে তাঁদের শিকড় গজিয়ে যেত। কোনো কোনো ঋষি নাকি আস্ত গাছই হয়ে গিয়েছিলেন। খাবারদাবার খেতেন না। মাটি থেকে রস গ্রহণ করতেন। আপনি শুনেছেন তাঁদের কথা?’

‘না স্যার। তবে...।’

‘তবে?’

কোন একটা ধর্মগ্রন্থে নাকি লেখা আছে, মানুষ আদিম অবস্থায় গাছ ছিল। মানে আমরা যেভাবে কল্পনা করি, সেটা নয়, প্রথমে মাটি ফুঁড়ে নাকি উদ্ভিদের মতোই মানুষের জন্ম। আপনি কি এ ব্যাপারে কিছু জানেন?’ বেশ উত্সাহ নিয়ে জানতে চাইল ওয়েস্টারবার্গ।

‘না। তা জানি না। কিন্তু এখন তো আমরা আদিম অবস্থায় নেই, তা–ই না।’

‘তা ঠিক।’

‘আর বিশেষ করে এত অল্প সময়ে গাছ হওয়াটাও অসম্ভব। আমাকে স্বীকার করতেই হচ্ছে, আপনার কাছেই এ রকম কথা আমি প্রথম শুনলাম।’

‘হ্যাঁ স্যার, আমি বুঝতে পারছি।’

‘আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার কেসটা নিয়ে কেন আমি ইন্টারেস্টেড। যখন আপনি বলছেন যে আপনি একটা গাছ, তার মানে হয়তো বোঝাতে চাচ্ছেন আপনার চলাফেরার ক্ষমতা নেই। অথবা আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে আপনি তরিতরকারির মতো, মানে প্রাণীর বিপরীত কিছু? নাকি অন্য কিছু? কী?’

করপোরাল বাইরের দিকে তাকাল। হঠাৎ করেই তার সব উত্সাহে ভাটা পড়ল। ‘আমি স্যার এর বেশি কিছু আপনাকে বলতে পারব না। সরি স্যার।’

‘আচ্ছা আপনি কি আমাকে বলবেন যে কীভাবে আপনি গাছ হয়ে গেলেন?’

করপোরাল ওয়েস্টবার্গারকে এবারও একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো। মুখ নিচু করে মেঝের দিকে তাকাল সে। তারপর জানালা দিয়ে স্পেসপোর্টের দিকে। ফের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল ডেস্কে উড়ে এসে বসা একটা মাছির দিকে। শেষমেশ উঠে দাঁড়াল। ‘আমি সেটাও আপনাকে বলতে পারব না স্যার।’

‘বলতে পারবেন না? কিন্তু কেন?’

‘কারণ...আমি ওয়াদা করেছি স্যার।’

রুমে কোনো শব্দ নেই। ডক্টর হ্যারিসও উঠে দাঁড়ালেন। মুখোমুখি দাঁড়ালেন দুজন। হ্যারিসের ভ্রুতে একটা ভাঁজ পড়ল, চোয়ালটা ঘষলেন ডান হাতে। ‘আচ্ছা আমাকে শুধু এটুকু বলুন, কার কাছে ওয়াদা করেছেন আপনি?’

‘দুঃখিত স্যার। আমি সেটাও আপনাকে বলতে পারব না।’

একটু চুপ থেকে করপোরালকে ভালো করে আরেকবার বোঝার চেষ্টা করলেন ডক্টর। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। ‘ঠিক আছে, করপোরাল। আপনি এবার আসুন। সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।’

‘সরি, আমি এর চেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারলাম না।’ বলে ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল করপোরাল। দরজা বন্ধ করে ভিডিও ফোনের কাছে এসে কমান্ডার কক্সকে ফোন করলেন হ্যারিস।

‘কক্স, ওয়েস্টবার্গের সঙ্গে কথা বলেছি আমি, ঠিক আছে? ওর কাছ থেকে কেবল একটাই তথ্য পেলাম যে সে গাছ হয়ে গেছে। ওর সম্পর্কে আমি তো আর কিছুই জানি না। ওর আচরণ, চলাফেরা কী রকম?’

‘ওয়েল।’ জবাব দিল কক্স, ‘প্রথম যে জিনিসটা ওর সঙ্গীরা লক্ষ করেছে, তা হলো ও কোনো রকম কাজ করছে না। গ্যারিসন চিফ আমার কাছে রিপোর্ট করেছে যে ও উদ্দেশ্যহীনভাবে গ্যারিসনের বাইরে সারা দিন বসে থাকে। স্রেফ বসে থাকে।’

‘এই মে মাসের প্রচণ্ড রোদের মধ্যেও?’

‘হ্যাঁ। অসহ্য রোদের মধ্যেও বসে থাকে। রাত হলেই শুধু ফিরে আসে গ্যারিসনে। গত সপ্তাহে একজন জিজ্ঞেস করে, জেন, রিপেয়ারের কাজে যাওনি কেন? ও তখন জবাব দিল, আমি তো বাইরে রোদে বসেছিলাম। তারপর বলল...।’

‘হ্যাঁ, কী বলল?’

‘বলল যে ওর কাজ আন–ন্যাচারাল। অস্বাভাবিক। প্রাকৃতিক নয়। ওসব করা সময়ের অপচয়। একমাত্র জরুরি কাজ হচ্ছে বাইরে গিয়ে বসে গভীরভাবে ধ্যান করা।’

নদীর ওপর ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে যাওয়া যায়। এখন ব্রিজের ওপর কিছু রোগী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নদী দেখছে উদ্দেশ্যহীনভাবে।

‘তারপর?’

‘ওরা তখন জিজ্ঞেস করল, এসব আজগুবি আইডিয়া কোথায় পেয়েছ? তখন এর জবাবে সে বলল যে সে নাকি গাছ হয়ে গেছে।’

‘শোনো, আমি ওর সঙ্গে আবার কথা বলব।...আচ্ছা. ও তো পদত্যাগের চিঠি দিয়েছে, তা–ই না? সেখানে কী কারণ দেখিয়েছে?’

‘ওই একই। সে গাছ হয়ে গেছে। এখন আর পেট্রলম্যান হিসেবে কাজ করার কোনো ইচ্ছা তার নেই। সে কেবল রোদের মধ্যে বসে থাকতে চায়। এ রকম উদ্ভট কথা আমি আমার বাপের জন্মে শুনিনি।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে। শোনো। আমি ডরমিটরিতে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করব।’ ঘড়ির দিকে তাকাল হ্যারিস। ‘রাতের খাবারটা সেরেই যাব। তুমি ব্যবস্থা করে রেখো।’

‘ঠিক আছে, সেটা করা যাবে।’ বিষণ্ন কণ্ঠে বলল কক্স। ‘কিন্তু ডাক্তার তুমি আমায় বলো তো, কে কবে শুনেছে যে একটা মানুষ গাছ হয়ে গেছে। ওকে যতবারই বলি এটা সম্ভব নয়, ও আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসে, যেন আমরা শিশু।’

‘আচ্ছা, আমি দেখি তোমার জন্য কিছু করতে পারি কি না।’

২

ওয়েস্টারবার্গের কোয়ার্টারে ওর সঙ্গে থাকে আরেক ছেলে, বিমান দুর্ঘটনায় আহত সে, তবে দীর্ঘ পরিচর্যায় অনেকখানি সেরেও উঠেছে। ডরমিটরির সামনে এসে একবার রুমের নম্বরগুলো ভালো করে দেখে নিলেন হ্যারিস।

একটা রোবট এগিয়ে এল। ‘আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি, স্যার?’

‘আমি করপোরাল ওয়েস্টারবার্গের ঘরটা খুঁজছিলাম।’

‘ডান দিকের ৩ নম্বর ঘরটা, স্যার।’

এগোলেন হ্যারিস। সম্প্রতি অ্যাস্টারয়েড ওয়াই থ্রিতে গ্যারিসন চালু করে লোকজন নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন বাইরে থেকে কোনো শিপ এলে পয়লা ওখানেই চেক ইন করতে হয়। ওই গ্যারিসনই তদারকি করছে যেন, বাইরে থেকে কোনো বিপজ্জনক ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস কিংবা এই গ্রহের জন্য ক্ষতিকর কিছু ঢুকে না পড়ে। খুবই সুন্দর একটা গ্রহাণু ছিল ওটা। উষ্ণতা, পর্যাপ্ত পানি, গাছপালা, লেক আর বিপুল পরিমাণ সৌরালোক নিয়ে দারুণ এই ওয়াই থ্রি। নয়টি গ্রহের মধ্যে এটাই সবচেয়ে আধুনিক গ্যারিসন হয়ে উঠল।

মাথা ঝাঁকিয়ে ৩ নম্বর রুমের সামনে দাঁড়ালেন হ্যারিস। হাত তুলে টোকা দিলেন দরজায়।

ওপাশ থেকে একটা তরুণ কণ্ঠ ভেসে এল, ‘কে ওখানে?’

‘আমি করপোরাল ওয়েস্টারবার্গকে দেখতে এসেছি।’

খুলে গেল দরজা। সুন্দর গাধা বলতে যেরকম বোঝায়, সেরকম একটা ফরসা ধবধবে তরুণের মুখ দেখা গেল। চোখে হরিণের শিংয়ের চশমা। হাতে একটা বই।

‘আপনি কে?’

‘ডক্টর হ্যারিস।’

‘অ্যাই অ্যাম সরি। করপোরাল ওয়েস্টারবার্গ ঘুমাচ্ছেন।’

‘ওকে জাগালে কি খুব বেশি মাইন্ড করবে? ওর সঙ্গে কথা বলা খুব জরুরি।’

উঁকি দিয়ে একবার ঘরের ভেতরটা দেখলেন হ্যারিস। পরিষ্কার–পরিচ্ছন রুম। একটা ডেস্ক, ছোট্ট একটা গালিচা পাতা মেঝেতে। ডেস্কের ওপর একটা ল্যাম্প। আর দুটো ছোট বিছানা। একটায় সটান চিৎ হয়ে ঘুমাচ্ছে ওয়েস্টারবার্গ, বুকের ওপর হাত দুটো জোড়া বাঁধা।’

‘স্যার’, মুখ খুলল সুন্দর গাধা, ‘আপনি বলেছেন, আমার ওকে ডাকাই উচিত, কিন্তু দুঃখিত, আমি বোধ হয় ওকে জাগাতে পারব না।’

‘পারবেন না? কেন?’

‘স্যার, আমি হাজার চেষ্টা করলেও করপোরাল ওয়েস্টারবার্গ উঠবেন না। সূর্যাস্তের পর ওনাকে ঘুম থেকে ওঠানো যায় না। উনি ওঠেন না। তাকে জাগানো অসম্ভব।’

‘ক্যাটালেপটিক নাকি? আপনি ঠিক বলছেন তো?’

‘জি স্যার, তবে সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওনার ঘুম ভেঙে যায়। লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উনি বাইরে চলে যান। সারা দিন বাইরেই থাকেন।’

‘আই সি’, বিড়বিড় করে বললেন হ্যারিস। ‘ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আপনাকে কষ্ট দিলাম।’

‘না, স্যার। ইটস ওকে।’

হলরুমের ভেতর দিয়ে বাইরে যেতে যেতে নিজের মনেই বলতে লাগলেন হ্যারিস, ‘যা ভেবেছিলাম, কেস তো দেখছি তার চেয়েও জটিল।’

৩

চমৎকার রোদেলা দিন। আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটাও নেই। নদীর কূল ছুঁয়ে পাইনের গাছগুলোকে দুলিয়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদুমন্দ হাওয়া। হাসপাতাল থেকে একটা পথ সোজা এই নদীর ঢালের দিকে চলে এসেছে। নদীর ওপর ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে যাওয়া যায়। এখন ব্রিজের ওপর কিছু রোগী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নদী দেখছে উদ্দেশ্যহীনভাবে। সবারই শরীরে বাথরোব জড়ানো।

ওয়েস্টারবার্গকে খুঁজে পেতে কয়েক মিনিট সময় লাগল হ্যারিসের। অন্য রোগীদের সঙ্গে ব্রিজের ওপর বা কাছে, আশপাশে কোথাও ছিল না সে। নদীর ঢাল বেয়ে আরও নিচে নেমে গিয়েছিল। নদীর একেবারে কিনারা ঘেঁষে একটা সমতল পাথরের টুকরার ওপর বসেছিল একটু পেছনের দিকে ঝুঁকে। মুখটা ওপরের দিকে, একটু খোলা। চোখ বন্ধ।

তার পাশে গিয়ে বসার আগ পর্যন্ত হ্যারিসকে খেয়ালই করেনি।

‘হ্যালো’ খুব আস্তে করে প্রায় তার কানের কাছে বললেন হ্যারিস।

চোখ খুলল ওয়েস্টারবার্গ। ওপরের দিকে তাকাল। মৃদু হেসে তার পায়ের ওপর ধীরে ধীরে এমন সাবলীলভাবে দাঁড়াল যেন একটা ঢেউ উঠল। একটু অবাকই হলেন হ্যারিস। তার মতো লম্বা মানুষের পক্ষে এমন উত্থান বিস্ময়কর। ‘হ্যালো, ডক্টর। এখানে কী মনে করে?’

‘তেমন কিছু নয়। ভাবলাম একটু সূর্যালোক উপভোগ করা যাবে।’

‘এদিকে আসেন। আমার এই পাথরের টুকরায় বসতে পারেন।’ বলে একটু সরে বসল করপোরাল। পাথরের বাকি অংশে খুব সাবধানে বসলেন হ্যারিস, যেন পাথরের ধারালো কোনায় তাঁর প্যান্টের কাপড় ছিঁড়ে না যায়। একটা সিগারেট ধরিয়ে শান্তভাবে সামনের বয়ে যাওয়া জলধারার দিকে চোখ রাখলেন। তাঁর পাশে ওয়েস্টারবার্গ আবার আগের মতো একটু পেছনে হেলান দিয়ে ওপরের দিকে মুখ তুলে চোখ বন্ধ করে বসে রইল।

‘চমত্কার দিন, তা–ই না?’

‘জি।’

‘প্রতিদিনই আসেন নাকি এখানে?’

‘জি।’

‘ঘরের চেয়ে বাইরেই আপনার বেশি ভালো লাগে, তা–ই না?’

‘ঘরে আমি থাকতেই পারি না।’ জবাব দিল ওয়েস্টারবার্গ।

‘পারেন না? পারেন না মানে কী?’

‘বাতাস ছাড়া আপনি কি বাঁচতে পারবেন?’ পাল্টা প্রশ্ন করল ওয়েস্টারবার্গ।

‘তার মানে বলতে চাইছেন সূর্যের আলো ছাড়া আপনি বাঁচতে পারেন না?’

মাথা ঝাঁকাল ওয়েস্টারবার্গ।

‘আচ্ছা করপোরাল, আমি কি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি? আপনি কি ঠিক করেছেন বাকি জীবনটা এভাবেই, মানে একটা পাথরের ওপর বসে বসে আলো খেয়ে কাটিয়ে দেবেন? আর কিছু করবেন না?’

আবারও মাথা ঝাঁকাল ওয়েস্টারবার্গ।

‘চাকরি? বছরের পর বছর লেখাপড়া করেছেন পেট্রলম্যানের চাকরি করবেন বলে। তার কী হবে? চমত্কার রেজাল্ট আপনার। ফার্স্টক্লাস পজিশন। সব ছেড়েছুড়ে দেবেন? একটুও খারাপ লাগবে না? ভালো করেই জানেন, একবার খোয়ালে এই চাকরি আর ফেরত পাবেন না। আপনি কি সেটা বুঝতে পারছেন?’

‘বুঝতে পারছি।’

‘সত্যিই সব ছেড়ে দেবেন বলে ঠিক করেছেন?’

‘ঠিক ধরেছেন। আমি স্যার অলরেডি রিজাইন করেছি।’

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন হ্যারিস। একসময় সিগারেটটা পাথরের গায়ে ঠেসে নিভিয়ে দিলেন। তাকালেন ওয়েস্টারবার্গের দিকে, ‘ঠিক আছে, বুঝলাম যে চাকরি ছেড়ে দেবেন এবং বসে বসে রোদ খাবেন। তারপর? তারপর কী হবে? আপনার জায়গায় অন্য কেউ চাকরি করবে। ঠিক কিনা বলেন? কাজটা তো কাউকে না কাউকে করতে হবে।’

‘আমারও তা–ই ধারণা।’

‘ওয়েস্টারবার্গ, ধরেন, সবাই যদি আপনার মতো নিজেকে গাছ মনে করতে শুরু করে, তাহলে কী হবে? মনে করেন সবাই ঠিক করল, তারা আর কাজ করবে না। সারা দিন বসে বসে রোদ খাবে, সৌরালোক পান করবে। তাহলে বাইরে থেকে যেসব শিপ আসবে, সেগুলোকে চেক করবে কে? ব্যাকটেরিয়া, টক্সিক ক্রিস্টাল যদি আমাদের সিস্টেমে ঢুকে পড়ে, যদি তার কারণে মানুষ রোগে ভুগতে শুরু করে, মরতে শুরু করে, সেটা কি ঠিক হবে?’

‘সবাই যদি আমার মতো ভাবতে শুরু করে, তাহলে তো আর সমস্যা নেই। কেউ তো আর মহাশূন্যে যেতে চাইবে না। ফলে চেকিংয়েরও দরকার হবে না।’

‘কিন্তু যেতে তো হবে, তা–ই না? আমাদের ব্যবসা–বাণিজ্য করতে হবে, খনিজ সম্পদ আহরণ করতে হবে, নতুন নতুন গাছপালার খোঁজ পেতে হবে।’

‘কেন?’

‘বাহ, সমাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে না?’

‘কেন?

‘কেন মানে, সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচবে কী করে?’

ওয়েস্টারবার্গ কিছু বলল না জবাবে। হ্যারিস তাকালেন তার দিকে। করপোরাল নিশ্চুপ।

‘আমি কি ভুল কিছু বললাম?’ আবার জিজ্ঞেস করল হ্যারিস।

‘সম্ভবত। এ এক অদ্ভুত কারবার, ডক্টর। আপনি জানেন, ট্রেনিংয়ের সময় বছরের পর বছর আমি কী কষ্ট করেছি। হাঁড়ি–পাতিল মেজেছি, থালাবাসন ধুয়েছি, রান্নাঘরে কাজ করেছি। রাতে পড়াশোনা করতাম, ঠেসে মুখস্থ করতাম। আর এখন আমি কী ভাবি, জানেন?’

‘কী?’

‘ইশশ, আমি যদি তখনই গাছ হতে পারতাম!’

উঠে দাঁড়ালেন হ্যারিস। ‘ওয়েস্টারবার্গ, যখন ভেতরে যাবেন, আমার অফিসে একবার দেখা করে যাবেন? আমি কিছু পরীক্ষা দিতে চাই।’

‘শক বক্স?’ মৃদু হাসল ওয়েস্টারবার্গ। ‘আমি জানতাম এটা আপনি করতে চাইবেন। ঠিক আছে। আমি কিছু মনে করছি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।’

যেন বিছুটি পাতা লেগেছে গায়ে, দ্রুত পাথরের টুকরা থেকে উঠে ওপরের দিকে হাঁটা ধরলেন হ্যারিস। একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন ওয়েস্টারবার্গের দিকে। ‘তিনটার দিকে আসবেন।’

মাথা ঝাঁকাল করপোরাল।

ঢাল বেয়ে ওপরের রাস্তায় উঠলেন হ্যারিস। হেঁটে হেঁটে হাসপাতাল পর্যন্ত গেলেন। পুরো বিষয়টি এখন তাঁর কাছে আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে তাঁর। সারা জীবন সংগ্রামের মধ্যে বেড়ে ওঠা একটা ছেলে ওয়েস্টারবার্গ। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ছিল। তার মধ্যেই লক্ষ্য ঠিক করে এগোতে হয়েছে তাকে। তারপর একসময় সে তার গন্তব্যে পৌঁছেছে। পেট্রল অ্যাসাইনমেন্টের কাজটা পেয়েছে। কিন্তু কাজের ভলিউম ছিল প্রচণ্ড। আর অ্যাস্টারয়েড ওয়াই থ্রিতে বিস্তর গাছপালা। একেবারে আদিম অবস্থা যাকে বলে। সারা দিন সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মধ্যে নানা রকম ভাবনার উদয় হয়েছে হয়তো। এবং একসময় বিকার দেখা দিয়েছে।

৪

হাসপাতালের ভেতরে ঢুকলেন হ্যারিস। একটা রোবট তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। ‘স্যার কমান্ডার কক্স জরুরি ভিত্তিতে আপনাকে যোগাযোগ করতে বলেছেন। ভিডিও ফোনে ওনাকে পাওয়া যাবে।’

‘ধন্যবাদ।’ লম্বা লম্বা পদক্ষেপে অফিসের দিকে এগোলেন হ্যারিস। কক্সকে ফোন করলেন। মনিটরে ভেসে উঠল কমান্ডারের চেহারা। ‘কক্স? হ্যারিস বলছি। আমি বাইরে গিয়েছিলাম ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে। আমার মনে হয়, ওর সমস্যার একটা লাইনআপ আমি করতে পারব। প্যাটার্নটা আমি ধরতে পেরেছি সম্ভবত। দীর্ঘদিন একটানা ভারী কাজের চাপে জর্জরিত ছিল ও। শেষ পর্যন্ত ও যা চায়, সে রকমভাবে নিজেকে ভাবতে শুরু করে এবং...।’

অরণ্যের ডাক

অলংকরণ: তীর্থ

‘হ্যারিস!’ প্রায় ঘেউ ঘেউ করে উঠল। ‘থামুন তো, আগে আমি যা বলি শুনুন। এই মাত্র ওয়াই থ্রি থেকে একটা রিপোর্ট পেয়েছি আমি। ওরা একটা এক্সপ্রেস রকেট পাঠাচ্ছে এখানে। রকেটটা রওনা দিয়েছে।’

‘এক্সপ্রেস রকেট!’

‘ওয়েস্টারবার্গের মতো আরও ৫টি কেস পাওয়া গেছে। ওরা সবাই বলছে যে ওরাও নাকি গাছ হয়ে গেছে। গ্যারিসন চিফের মাথা খারাপ হওয়ার যোগাড়। যেভাবে হোক, এটার একটা সুরাহা করতে হবে, নইলে পুরো গ্যারিসন অচল হয়ে যাবে শিগগিরই। আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন হ্যারিস? শিগগিরই খুঁজে বের করুন কারণটা কী? কেন ওরা এ রকম আচরণ করছে।’

‘ঠিক আছে।’ বিড় বিড় করে বলল হ্যারিস। বলার মধ্যে কোনো জোর নেই।

সপ্তাহ ফুরানোর আগেই ২০টি কেইস পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, সব কটিই এসেছে ওয়াই থ্রি থেকে।

৫

পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে নিচে নদীর তীরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন হ্যারিস ও কক্স। চেহারা মলিন। ১৬ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী বসে আছে নদীর তীর ধরে। কেউ কোনো কথা বলছে না। নড়াচড়াও করছে না। বসে বসে রৌদ্রালোক পান করছে। ঘণ্টাখানেক হলো পাহাড়ের চূড়া থেকে ওদের লক্ষ করছেন ডাক্তার ও কমান্ডার। কারও মধ্যে কোনো বিকার নেই।

‘আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।’ মুখ খুললেন কক্স। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, ‘একেবারেই কিছু ঢুকছে না আমার মাথায়। হ্যারিস, এটা কি এখানেই থামবে বলে মনে করেন। নাকি এটা কেবল শুরু। এ রকম চললে তো সবকিছু ধসে পড়বে।’

‘আচ্ছা, ওই লাল চুলের লোকটা কে?’ নিচের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন হ্যারিস।

‘উলরিখ ডয়েটশ। গ্যারিসনের সেকেন্ড ইন কমান্ড। অথচ দেখেন, কী অবস্থা তার! বসে বসে চোখ বন্ধ করে মুখ খুলে আলো পান করছে। গ্যারিসন চিফ অবসর নিলে ও-ই পরবর্তী চিফ হতো। আর বড়জোর একটা বছর। সারাটা জীবন এই পদে ওঠার জন্য জীবনপাত করেছে লোকটা।’

‘অথচ এখন বসে বসে রোদ পোহাচ্ছে।’

‘ওই যে মেয়েটাকে দেখছেন, ওই যে ছোট ছোট ঘন বাদামি চুলের শ্যামলা মেয়েটি, ভীষণ ক্যারিয়ারিস্ট। গ্যারিসনের পুরো অফিস স্টাফদের প্রধান ও। আর ওর পাশের লোকটা একটা দারোয়ান। আর ওই যে ছোট মেয়েটা, মাত্র যোগ দিয়েছে কাজে, সেক্রেটারি হিসেবে। অল্প কিছুদিন আগেই লেখাপড়া শেষ করেছে। সব ধরনের লোক আছে এদের মধ্যে। সকালে একটা নোট পেলাম, আরও তিনজন আজ যেকোনো সময় যোগ দিতে যাচ্ছে ওদের সঙ্গে।’

মাথা নাড়লেন হ্যারিস। ‘অদ্ভুত ব্যাপারটা কী জানেন, ওরা সত্যিই ওখানে বসতে চায়। কথা বললে বুঝবেন, ওদের বিচারবুদ্ধিও আছে। ওরা অন্য কিছু যে করতে পারে না, তা নয়। কিন্তু ওরা সেসব কেয়ার করে না।’

‘ওয়েল।’ কক্স বলল, ‘কী করতে যাচ্ছেন? কিছু বের করতে পেরেছেন? আমরা কিন্তু আপনার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে আছি। কিছু একটা বলুন, শুনি।’

‘সরাসরি কিছু এখনো বুঝতে পারিনি।’ বললেন হ্যারিস, ‘কিন্তু শক বক্স থেকে কিছু অদ্ভুত ফলাফল পেয়েছি। চলেন ভেতরে যাই, দেখাচ্ছি।

‘ফাইন।’ ঘুরে হাসপাতালের দিকে হাঁটা শুরু করলেন দুজনই। ‘যা–ই পান না কেন, আমাকে একটু দেখান। বিষয়টা খুব সিরিয়াস।’

৬

তিনটে সুইচই অফ করে দিলেন হ্যারিস। নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে গেল পুরো ঘরটা। অভ্যস্ত পায়ে চলে গেলেন তিনি দেয়াল বরাবর প্রজেক্টর টেবিলের দিকে। ‘প্রথম রিলটা দেখাচ্ছি। গ্যারিসনের সেরা বায়োলজিস্টকে দেখতে পাবেন এতে। রবার্ট ব্রাডশ। গতকাল এসেছেন। ওর মনমানসিকতা অন্যদের চেয়ে বিশেষভাবে আলাদা। ননর‌্যাশনাল স্বভাবের অনেক অবদমনের চিহ্ন ধরা পড়ে ওর আচরণে। স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি।’

একটা সুইচ অন করলেন হ্যারিস। বোঁ বোঁ শব্দ করে চালু হলো প্রজেক্টর। দূরের দেয়ালে ভেসে উঠল রঙিন ত্রিমাত্রিক ছবি। এতটাই জীবন্ত ছবি যে মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছিল লোকটা ঘরের মধ্যেই হাঁটাচলা করছে। রবার্ট ব্রাডশর বয়স ৫০–এর কাছাকাছি হবে। ধোপদুরস্ত। লালচে ধূসর রঙের চুল। চৌকো মুখ। শান্তভাবে একটা চেয়ারে বসেছিল। চেয়ারের হাতলে রাখা হাত দুটো। ঘাড় ও কবজিতে ইলেকট্রোড যুক্ত করা। ‘এই যে এখানে,’ বললেন হ্যারিস, ‘লক্ষ করুন।’

দেয়ালে দেখা গেল ব্রাডশর একটা ফিল্ম ইমেজ। এবং হ্যারিসের ইমেজ দাঁড়াল ব্রাডশর সামনে। ‘মিস্টার ব্রাডশ।’ ইমেজটি বলল, ‘এতে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমাদের অনেক উপকার।’ বলে ইমেজটা শক বক্সের কন্ট্রোল বাটনগুলো ঘুরিয়ে দিল। একটু জড়সড় হয়ে গেলেন ব্রাডশ। চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠল। এ ছাড়া অবশ্য আর কোনো সমস্যা দেখা গেল না। হ্যারিসের ইমেজ কিছুক্ষণ সময় দিল তাকে। তারপর কন্ট্রোলগুলো থেকে সরে এল।

‘আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন মিস্টার ব্রাডশ?’ প্রশ্ন করল ইমেজ।

‘জি।’

আপনার নাম?’

‘রবার্ট সি ব্রাডশ।’

‘পজিশন কী?’

‘চেক স্টেশন ওয়াই থ্রির চিফ বায়োলজিস্ট।’

‘আপনি কি এখন সেখানে আছেন?’

‘না। আমি টেরাতে ফিরে এসেছি। আমি এখন একটা হাসপাতালে আছি।’

‘কেন?’

‘কারণ গ্যারিসন চিফের কাছে আমি স্বীকার করেছি যে আমি একটা গাছ হয়ে গেছি।’

‘এটা কি ঠিক, আপনি গাছ হয়ে গেছেন?’

‘হ্যাঁ। নন-বায়োলজিক্যালি আমি এখন একটা গাছ। যদিও আমার শরীরটা এখনো মানুষের মতো।’

‘তাহলে আপনি গাছ হলেন কীভাবে?

‘এটা আসলে একটা অ্যাটিচিউডিনাল রেসপন্স।’

‘বলে যান।’

‘উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট প্রাণীর পক্ষে এ রকমটা সম্ভব। উঁচু স্তরের প্রাইমেটরা সাইকোলজিক্যালি একটা গাছের মতো হতে পারে।’

‘আচ্ছা?’

‘আমিও সে রকম হয়েছি।’

‘আর অন্যরা? তাদেরও কি একই কাহিনি?’

‘জি।’

‘কীভাবে ঘটল এটা? এই যে আপনার মনটা গাছের মতো হয়ে গেল?’

ব্রাডশর ইমেজকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো। জোর করে ঠোঁট দুটো চেপে ধরে আছে। ‘লক্ষ করুন।’ কক্সের উদ্দেশ্য বললেন হ্যারিস, ‘প্রবল দ্বন্দ্ব চলছে ওর মনের ভেতরে। পুরো সচেতন থাকলে ও আর আগ বাড়াত না।’

‘আমি...।’ তোতলাতে শুরু করল ব্রাডশর ইমেজ।

‘জি, জি...’

‘আমাকে গাছ হওয়ার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।’

পর্দায় হ্যারিসের বিস্ময় আর আগ্রহ দুটোই দেখা গেল যুগপৎ। ‘মানে? আপনাকে গাছ হওয়ার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?’

‘ওরা আমার সমস্যাগুলো বুঝতে পেরেছে। আর তারপরই আমাকে গাছ হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এখন আমার আর আগের সমস্যাগুলো নেই।’

‘কে? কারা শিক্ষা দিয়েছে?’

‘পাইপাররা।

‘কারা? পাইপার? কারা এই পাইপার?

কোনো জবাব নেই।

‘মিস্টার ব্রাডশ। এই পাইপাররা কারা?’

দীর্ঘক্ষণ নিজের দ্বিধার সঙ্গে লড়াই করে শেষে মুখ খুললেন ব্রাডশ। ‘ওরা জঙ্গলে থাকে।’

প্রজেক্টর বন্ধ করে দিল হ্যারিস। আলো জ্বালাল। কক্স আর হ্যারিস দুজনই কিছুক্ষণ চোখ পিটপিট করল।

‘এটুকুই আমি বের করতে পেরেছি। এটুকুও ওর বলার কথা নয়। এসব কথা ওরা কাউকে বলবে না বলেই কসম খেয়েছে। আমার কপাল ভালো, কথাগুলো বের করতে পেরেছি।’

‘২০ জনেরই কি বক্তব্য একই রকম। ওদের সবার সঙ্গে কি কথা বলেছ?’

‘না।’ মুখ বাঁকিয়ে একটু হাসল হ্যারিস। ‘ওদের অধিকাংশই মুখ খোলেনি। একেবারে ঠোঁট চেপে বসেছিল। ওদের কাছ থেকে কোনো কথা বের করা যায়নি।’

চিন্তার রেখা ফুটল কক্সের চেহারায়। ‘পাইপারস, না? তো এখন কী করতে বলেন? পুরো বিষয়টা বোঝা পর্যন্ত কি অপেক্ষা করব? আপনার পরিকল্পনা কী?’

‘না।’ হ্যারিস জবাব দিল সঙ্গে সঙ্গেই, ‘মোটেই তা নয়। আমি নিজেই ওয়াই থ্রিতে যাব। পাইপার কারা, সেটা খুঁজে বের করব। বিষয়টার শেষ দেখতে চাই আমি।’

৭

ছোট্ট পেট্রল শিপটা খুব সাবধানে ল্যান্ড করল। মৃদু যান্ত্রিক শব্দটুকুও একেবারে থেমে যাওয়ার পর দরজা খুলে গেল আর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে রোদে পোড়া এক বাদামি ল্যান্ডিং ফিল্ডের মাঝখানে আবিষ্কার করলেন হ্যারিস। ফিল্ডের এক প্রান্তে একটা লম্বা সিগন্যাল টাওয়ার। এ ছাড়া সব দিকে লম্বা ধূসর রঙের বিল্ডিং, ঘিরে আছে ল্যান্ডিং ফিল্ডকে। এটাই গ্যারিসন চেক স্টেশন। একটু দূরে তাকাতেই হ্যারিস দেখতে পেলেন একটা বিশাল ভেনুসিয়ান ক্রুজার পার্ক করা। চেক স্টেশনের জনা দশেক টেকনিশিয়ান তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখছে কোনো বিধ্বংসী জীব বা জীবাণু আছে কি না ওতে। কিংবা কোনো বিষাক্ত পদার্থ লেগে আছে কি না, যন্ত্রযানের কোনো অংশে, যা বিপদ ডেকে আনতে পারে।

‘অল আউট স্যার।’ বলল পাইলট।

মাথা ঝাঁকালেন হ্যারিস। স্যুটকেস দুটো হাতে নিয়ে সাবধানে নেমে এলেন নিচে। ফিল্ডের ফ্লোর তেতে আছে। উজ্জ্বল রোদের ঝলক সইতে না পেরে বারকয়েক চোখ পিট পিট করলেন। আকাশে বৃহস্পতি তার বিশাল বপু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখান থেকে প্রতিফলিত বিপুল পরিমাণ আলোয় ভেসে যাচ্ছে এই ছোট্ট গ্রহাণু।

লম্বা পা ফেলে ল্যান্ডিং ফিল্ড পেরিয়ে সিগন্যাল টাওয়ারের দিকে হাঁটা শুরু করলেন হ্যারিস। কাছাকাছি আসতেই টাওয়ারের দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক লোক। বয়স্ক, চুল পেকে গেছে, দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান। দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন তিনি হ্যারিসের দিকে। ‘কেমন আছেন ডক্টর।’ দুজনই হাত মেলালেন।

‘আমি লরেন্স ওয়াটস। গ্যারিসন চিফ।’

হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতেই হ্যারিসের দিকে ঝুঁকে মৃদু হেসে বললেন, ‘জার্নি কেমন হলো?’

নীল রঙের ইউনিফর্ম পরে আছেন ওয়াটস। কাঁধের ওপর ধাতব ব্যাজ রোদে চমকাচ্ছে।

একটা লোক যদি এই সিস্টেম থেকে বেরিয়ে যায় তখন মহাবিপদ দেখা দেয়। অন্য সব কাজের ওপরও তার প্রভাব পড়ে।

‘ভালোই।’

চলুন ভেতরে যাই। আপনার জন্য কিছু পানীয়র ব্যবস্থা করে রেখেছি। আকাশের ওই বড় আয়নাটার জন্য এখানে ভীষণ গরম।’

‘জুপিটার?’ দালানের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল হ্যারিস। ভেতরটা বেশ ঠান্ডা এবং অন্ধকারও বটে। ‘আচ্ছা ভালো কথা, এখানকার গ্র্যাভিটি তো প্রায় টেরার মতোই। আমি তো ভেবেছিলাম, ক্যাঙারুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে হবে। গ্র্যাভিটি কি আর্টিফিশিয়ালি কন্ট্রোল করা হয়েছে?’

‘না। এখানে হয়তো বিশেষ ধরনের ধাতব পদার্থের বিশাল মজুত আছে। এ কারণেই এ গ্রহাণুকে বেছে নিয়েছিলাম আমরা। কনস্ট্রাকশনের কাজ করতে কোনো বেগই পেতে হয় না। প্রাকৃতিক পানি আর বাতাসও আছে। পাহাড়গুলো খেয়াল করেছেন?’

‘পাহাড়?’

‘আচ্ছা বুঝেছি, চারদিকের দালানগুলোর জন্য দেখতে পারেননি। চলুন, টাওয়ারের ওপর যখন উঠব, তখন দালানগুলোর ওপারে দেখতে পাবেন, একেবারে অরণ্য যাকে বলে, খুব বড় নয় কিন্তু যাকে বলে ন্যাচারাল পার্ক। আপনি যা চান সে রকম সবকিছুই পাবেন ওখানে।’ বলতে বলতে হ্যারিসকে নিয়ে একটা ঘরে ঢুকে গেল দুজনে। ‘এদিকে আসুন। এটা আমার অফিস।’

ছোট্ট কিন্তু চমত্কার পরিপাটি ওয়াটসের অফিসটা। চারদিকে চোখ বোলালেন হ্যারিস।

‘কী? কেমন, সুন্দর না? আমি ঠিক করেছি শেষ বছরটা এখানে ভালোভাবে কাটিয়ে যাব।’ বলতে বলতেই ভ্রুতে একটু ভাঁজ পড়ল ওয়াটসের। ‘অবশ্য ডয়েশ চলে গেলে আলাদা কথা। সে ক্ষেত্রে হয়তো আমাকে এখানে আজীবনই থেকে যেতে হবে। যা–ই হোক।’ কাঁধ ঝাঁকালেন ভদ্রলোক। ‘আপনি বসুন, হ্যারিস।’

ধন্যবাদ জানিয়ে একটা চেয়ার টেনে পা ছড়িয়ে বসলেন হ্যারিস। ওয়াটসের দিকে তাকালেন। ‘বাই দ্য ওয়ে, আর কোনো কেস কি এসেছে আপনার হাতে?’

হু। আজ দুজনকে পেয়েছি। বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব এল। ‘সব মিলিয়ে প্রায় জনা তিরিশেক। স্টেশনে মোট লোক আছে তিন শ।’ একটু হেসে যোগ করলেন, ‘তবে যে হারে মানবগাছের সংখ্যা বাড়ছে...।’

‘চিফ, আপনি এখানে একটা জঙ্গলের কথা বলেছিলেন। আপনার ক্রুরা কি ওদের ইচ্ছেমতো ওই জঙ্গলে যেতে পারে। নাকি এই বিল্ডিং আর ল্যান্ডিং গ্রাউন্ডেই ওদের চলাফেরা সীমিত।’

হ্যারিসের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে হাতের চেটোয় চোয়ালটা একটু ঘষে নিলেন ওয়াটস। ‘ওয়েল, এই স্টেশনটা কিন্তু আর দশটা স্টেশনের মতো নয়। এটা একটু ডিফিকাল্ট টাইপের। এখানে গ্রাউন্ডে যারা কাজ করে, তাদের মাঝেমধ্যে ছেড়ে দিতে হয়। ওরা দালানের ভেতরে থেকে জঙ্গলের দিকে তাকাতে পারে। এটা ভালো। সামনে বিস্তৃত একটা সুন্দর অরণ্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেও শরীর–মন দুটোরই রিল্যাক্স হয়। প্রতি ১০ দিনে ওরা ১ দিন ছুটি পায়। পুরো দিন ছুটি থাকে। তখন নিজেদের মতো স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়।’

‘এর পরপরই তো ঘটনাটা ঘটে। তা–ই না?’

‘হ্যাঁ। আমারও তাই ধারণা। কিন্তু যত দিন ওরা অরণ্যটা দেখতে পাবে, ওখানে যেতে চাইবেই। আমি এটা ঠেকাতে পারব না।’

‘আমি জানি। আমি বলছি না ওদের নিষেধ করুন। আচ্ছা, এই সমস্যাটা নিয়ে আপনার ব্যাখ্যাটা কী, বলবেন? আপনার কী মনে হয়? বাইরে গেলে কী ঘটে? ওরা কী করে?’

‘কী ঘটে, সেটা তো বলা মুশকিল। তবে একবার ওরা বাইরে গেলে ফিরে এসে আর কাজ করতে চায় না। হকি খেলবে। অন্য কিছু করবে। কিন্তু ডিউটি করবে না।’

‘আপনার কি মনে হয়? ওদের এই ডিলিউশন সম্পর্কে?’

এক প্রস্থ হাসলেন ওয়াটস। ‘শোনেন ডক্টর হ্যারিস। আপনিও জানেন, আমিও জানি যে এটা একধরনের ঘোর। ওরা গাছ নয়, আপনার–আমার মতোই মানুষ। ওরা আসলে কাজ করতে চায় না। এটাই হলো আসল কথা। আমি যখন ক্যাডেট ছিলাম, তখন বুদ্ধি করে অন্যদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতাম। কিছু টেকনিক ছিল আমাদের। আমার মনে হয়, সে রকম কিছু চালাকি ওদের সঙ্গে করতে হবে।’

‘আই সি। তাহলে এটাই আপনার ধারণা?’

‘কেন, আপনি কি মনে করেন না এটাই মূল কারণ?’

‘না,’ বলল হ্যারিস। ‘আমার মনে হয় না, ওরা চালাকি করছে। ওরা সত্যিই বিশ্বাস করে যে ওরা গাছ হয়ে গেছে। শক বক্সে হাই ফ্রিকোয়েন্সি শক ট্রিটমেন্ট দিয়ে দেখেছি আমি। ওদের পুরো নার্ভাস সিস্টেম একরকম প্যারালাইজড হয়ে গেছে। এখন ওরা যা বলে, সত্য বলে এবং সবাই একই কথা বলে।’

ওয়াটস হাতের তালু দুটো জুড়ে মাথার পেছনে নিয়ে হেলান দিলেন চেয়ারে। ‘দেখুন হ্যারিস, আপনি একজন ডক্টর। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আপনি কী করছেন। কিন্তু এখানকার পরিস্থিতির দিকে একবার খেয়াল করুন। চমত্কার একটা গ্যারিসন এটা। একটা আদর্শ আধুনিক গ্যারিস। আমাদের সিস্টেমের সবচেয়ে আধুনিক আউটফিটগুলো রয়েছে এখানে। প্রতিটি নতুন ডিভাইস, নতুন গেজেট আবিষ্কারের পরপরই চলে আসে এখানে। হ্যারিস, এই গ্যারিসন নিজেই একটা বিরাট মেশিন। এখানকার মানুষগুলো এর অংশ। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কাজ আছে। মেইনটেইন্যান্স ক্রু, জীববিজ্ঞানী, অফিস ক্রু, ম্যানেজারিয়াল স্টাফ…।

‘একটা লোক যদি এই সিস্টেম থেকে বেরিয়ে যায়, তখন মহাবিপদ দেখা দেয়। অন্য সব কাজের ওপরও তার প্রভাব পড়ে। মেশিনটা যদি ঠিক না থাকে, তাহলে সেটা দিয়ে বাগগুলোকে আমরা আটকাব কীভাবে? কেউ যদি ঠিকমতো রিপোর্ট না করে, তাহলে খাবারের জন্য অর্ডার দেওয়াটাও তো সম্ভব হয় না আমাদের পক্ষে। সেকেন্ড ইন কমান্ড যদি গিয়ে রোদের মধ্যে বসে থাকে সারা দিন, তাহলে সব কাজকর্ম তো বন্ধ করে রাখতে হয়।

‘৩০ জন মানুষ মানে বুঝতে পারছেন? গ্যারিসনের ১০ ভাগের ১ ভাগ। ওদের ছাড়া কাজ চালিয়ে নেওয়া অসম্ভব। গ্যারিসনটা তৈরিই হয়েছে এভাবে। এখন ওদের সাপোর্ট না থাকলে পুরো সিস্টেমটাই ভেঙে পড়বে। এখান থেকে কেউ বেরিয়ে যেতে পারবে না এবং এটা জেনেশুনেই এরা এখানে কাজ করতে এসেছে। নিজের খেয়ালখুশিমতো চলার কোনো অধিকার ওদের নেই। অন্যদের প্রতি এটা একটা বড় ধরনের জুলুম।’

৮

মাথা ঝাঁকালেন হ্যারিস, ‘চিফ, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?’

‘কী কথা?’

‘অ্যাস্টারয়েডে আগে থেকে কোনো বসতি ছিল নাকি? কোনো আদিবাসী?’

‘আদিবাসী?’ এক মুহূর্ত ভাবলেন ওয়াটস। ‘হ্যাঁ, একধরনের আদিবাসী আছে এখানে।’ অস্পষ্টভাবে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে নির্দেশ করলেন তিনি।

‘ওরা দেখতে কেমন? আপনি কি ওদের কাউকে দেখেছেন?’

‘হ্যাঁ। দেখেছি। আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখনই দেখেছি ওদের। আশপাশে কিছুক্ষণ ছিল ওরা। আমাদের খানিক পর্যবেক্ষণ করে তারপর হাওয়া হয়ে গেল। এরপর আর দেখিনি কখনো।

‘ওরা কি সব মরে গেছে? কোনো ধরনের রোগের সংক্রমণ বা অন্য কোনো কিছুতে?

‘না। মারা গেছে কি না বলতে পারব না। স্রেফ গায়েব হয়ে গেছে। ওই জঙ্গলেই হয়তো কোথাও আছে।’

‘কেমন ছিল ওরা?’

‘ওরা নাকি এসেছিল অন্য কোনো গ্রহ থেকে, এটা সবাই বলে। কালো, একেবারে তামার মতো কালো। পাতলা শরীর। তবে খুবই চটপটে। শিকার করে আর মাছ ধরে খায়। লিখিত কোনো ভাষা নেই ওদের। ওদের নিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাইনি।’

‘আচ্ছা।’ একটু থেমে আবার মুখ খুললেন হ্যারিস, ‘আপনি কি কখনো পাইপারদের কথা শুনেছেন?’

‘পাইপার?’ ভ্রু কোঁচকালেন ওয়াটস। ‘না তো। এ রকম কিছু শুনিনি। কেন বলুন তো?’

‘রোগীরা পাইপারদের কথা বলছিল। ব্রাডশর কথা অনুযায়ী পাইপাররাই নাকি ওকে গাছ হতে শিখিয়েছে। ওদের কাছ থেকেই দীক্ষা পেয়েছে সে।’

‘পাইপারস? এরা কারা?’

‘আমিও তো জানি না।’ নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করলেন হ্যারিস। ‘আমি তো ভেবেছিলাম আপনি হয়তো বলতে পারবেন। আমার প্রথম অনুমান ছিল, ওরা এখানকার স্থানীয় আদিবাসী হবে। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত নই। বিশেষ করে আপনার বর্ণনা শোনার পর আমি কনফিউজড।’

‘এখানের নেটিভরা একেবারেই আদিম। কাউকে কিছু শেখানোর কোনো যোগ্যতাই ওদের নেই। বিশেষ করে একজন শীর্ষস্থানীয় ফ্লাইট বায়োলজিস্টকে ওরা কি শেখাবে?’

হ্যারিসকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো। ‘চিফ, আমি ওই অরণ্যের ভেতরে যেতে চাই। ভেতরে একটু ঘুরে দেখতে চাই। সম্ভব?’

‘অবশ্যই। এটুকু ব্যবস্থা আমি আপনার জন্য করতে পারব। সঙ্গে একজন দিয়ে দেব, ও আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাবে।’

‘আমি আসলে একা যেতে চাচ্ছি। কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই তো?’

‘না। আমার জানামতে ভয়ের কিছু নেই। তবে…।’

পাইপারদের কথা ভাবছেন?’ ওয়াটসের মুখের কথা শেষ করলেন হ্যারিস। ‘আমি জানি ওদের খুঁজে পাওয়ার এই একটাই পথ। ওখানে যাওয়া। আমি সুযোগটা নিতে চাই।’

মিনিট দশেক পরের কথা। গ্যারিসনের বাইরে একটা ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

‘সোজা হেঁটে এলে আপনি নিজে নিজেই ফিরে আসতে পারবেন গ্যারিসনে। ঘণ্টা ছয়েক সময় লাগবে বড়জোর।’ হাসলেন ওয়াটস, ‘খুব ছোট অ্যাস্টারয়েড এটা, বুঝলেন। এর মধ্যেই আবার কিছু নদী, কিছু লেকও আছে। সাবধানে চলবেন, ওগুলোতে পড়ে যাবেন না যেন।’

‘সাপখোপ নেই? বিষধর পোকামাকড়?’

‘তেমন কিছু তো শুনিনি। প্রথম দিকে বিস্তর টহল দিয়েছি। তেমন কিছুর সাক্ষাৎ মেলেনি।’

‘ধন্যবাদ চিফ।’ হ্যারিস বললেন। হাত মেলালেন দুজনে।

‘রাত বেশি হওয়ার আগেই ফিরে আসব।’

‘গুড লাক।’ দুই সশস্ত্র প্রহরীকে নিয়ে ঢাল বেয়ে গ্যারিসনের দিকে হাঁটা ধরলেন চিফ। বিল্ডিংয়ে ঢোকার আগ পর্যন্ত ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন হ্যারিস। এরপর ফিরে পা বাড়ালেন অরণ্যের দিকে।

৯

শান্ত, নির্জন বন। তারই ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকলেন হ্যারিস। ইউক্যালিপটাসের মতো বিশাল বিশাল সব গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে চারপাশে। পায়ের তলার মাটি নরম, অজস্র গাছের পাতা পড়ে মাটিতে মিশে মিশে প্যাচপেচে হয়ে আছে। দীর্ঘ গাছের বনাঞ্চল ছাড়িয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে হ্যারিস নিজেকে আবিষ্কার করলেন এক বিস্তীর্ণ তৃণভূমির সামনে। রোদে পুড়ে ঘাস আর আগাছাগুলো বাদামি হয়ে গেছে। লম্বা লম্বা আগাছার সারির ভেতর থেকে নানা রকম পোকামাকড় উড়ছে আশপাশে। নবাগত হ্যারিসকে ঘিরে বেশ কৌতূহল দেখা গেল তাদের মধ্যে। হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে দিয়ে তড়িঘড়ি করে কিছু একটা চলে গেল। একটু এগিয়ে ভালো করে দেখলেন হ্যারিস। বহুপদী পোকাবিশেষ, শরীরটা বলের মতো গোলাকার। ভীতসন্ত্রস্ত পোকাটির শুঁড়গুলো দুলছিল প্রবলবেগে।

সামনের দিকে তাকালেন হ্যারিস। তৃণভূমি শেষ হয়েছে এক পাহাড়ের পাদদেশে।

ঘণ্টাখানেক হেঁটে পাহাড়ের নিচে এসে একবার তাকালেন চূড়ার দিকে। তারপর বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। সবুজ গোলাপে ছাওয়া পাহাড়টার চূড়ায় যখন উঠলেন, তখন ঘেমে–নেয়ে একসা, বুকটা রীতিমতো ধড়ফড় করছে তাঁর।

একটু জিরিয়ে এবার নিচের গিরিখাতের দিকে পা বাড়ালেন। গাছের মতো লম্বা সব ফার্ন চারদিকে। ধীরে ধীরে যেন এক জ্যান্ত জুরাসিক পার্কের ভেতরে ঢুকে পড়লেন হ্যারিস। পা ফেলতে লাগলেন সাবধানে। বাতাস ধীরে ধীরে ঠান্ডা লাগাতে শুরু করল। গিরিখাতের তলাটা কিছুটা আর্দ্র।

একটা সমতল টেবিলের মতো জায়গায় এসে দাঁড়ালেন হ্যারিস। চারদিকে লম্বা লম্বা ফার্নের কারণে জায়গাটা অন্ধকার হয়ে আছে। একটা ন্যাচারাল পথ ধরে এগোলেন তিনি। পুরোনো শুকনো একটা নদীর তলদেশ। রুক্ষ, পাথুরে কিন্তু সহজে হেঁটে যাওয়া যায়। নদীপথ বেয়ে এগোতে এগোতে হ্যারিস টের পেলেন, বাতাস ভারী হয়ে উঠছে, চেপে বসছে বুকের ওপর। শ্বাস নিতে একটু কষ্ট হচ্ছে। ফার্নগুলোর ওপর দিয়ে তাকিয়ে পরের পাহাড়টার এক পাশ দেখতে পেলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর চোখের সামনে যেন একটা সবুজ মাঠ জেগে উঠল।

সামনেটা ধূসর। টিলাময় পথ, পাথর আর বোল্ডার ছড়িয়ে–ছিটিয়ে আছে। নদীর তল ওই সব পাথর আর বোল্ডারের দিকে গেছে। জায়গাটা আসলে অনেকটা পুকুরের আকার নিয়েছে। এখানেই নদীর শেষ। বেশ কসরত করে প্রথম বোল্ডারটায় চড়লেন হ্যারিস। বিশ্রাম নিলেন কিছুক্ষণ।

ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন নয়, ভাবলেন হ্যারিস। এতটা পথ হাঁটলেন কোনো নেটিভের দেখা মিলল না। ওদের দেখা মিললে হয়তো রহস্যজনক পাইপার সম্পর্কে কিছু তথ্য মিলত, যদি আদৌ সে রকম কিছু থেকে থাকে। গ্যারিসন থেকে মানুষ গায়েবের একটা হিল্লে­ হতো। নেটিভদের দেখা পেলে ওদের সঙ্গে কথা বলে কিছু একটা বের করতে পারতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এখন পর্যন্ত সাফল্যের কোনো সূত্র মিলছে না। চারদিকে ভালো করে তাকালেন। নির্জন গভীর বন। মৃদুমন্দ বাতাসে দুলছে ফার্নগুলো, তারই মর্মর ধ্বনি বাতাসে। এটুকুই। কিন্তু কোনো নেটিভের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। হয়তো কোথাও দল বেঁধে বাস করে ওরা। অ্যাস্টারয়েডটা খুব বড় নয়। রাত নামার আগেই ওদের খুঁজে বের করতে পারবেন, ভাবলেন তিনি।

১০

টিলা থেকে নামতে শুরু করলেন। সামনে আরও আরও টিলা। সেগুলোও টপকে গেলেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে কান পাতলেন। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা একটা শব্দ কানে বাজল তাঁর। জলের কল কল শব্দ। সামনে কি তাহলে কোনো পুকুর আছে? আবার এগোতে লাগলেন। হামাগুড়ি দিয়ে টিলায় উঠে আবার নেমে ছুটতে লাগলেন শব্দটার উত্স লক্ষ করে। হঠাৎ নীরব হয়ে গেল চারদিক। এবং দূর থেকে ভেসে এল জলপতনের শব্দ। হয়তো কোনো জলপ্রপাত। বা কোনো গতিশীল স্রোত। কোনো নদী। নদীর দেখা পেলে নেটিভদের দেখা পাওয়া দুষ্কর হবে না, ভাবলেন হ্যারিস।

টিলার পথ ফুরাল। দেখা মিলল একটা নদীর তলদেশের। তবে এবারেরটা ভেজা, কর্দমাক্ত, ছত্রাকে ছাওয়া। বুঝলেন, তিনি ঠিক পথেই আছেন। খুব বেশি দিন হয়নি এটার জল শুকিয়েছে। হয়তো কিছুদিন আগেই এখানে বর্ষাকাল ছিল। ফার্ন আর লতাপাতা হাত দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে নদীর তীরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হাঁটতে লাগলেন পাড় ধরে। সরাত করে একটা সোনালি রঙের সাপ চলে গেল তাঁর সামনে দিয়ে। সামনে কিছু একটা জ্বলজ্বল করে উঠল, ফার্ন গাছগুলোর ভেতর দিয়েই দ্যুতি ছড়াচ্ছে জিনিসটা। একটু এগিয়ে চোখে পড়ল পুকুরটা। তারই জলে আলো পড়ে ঝকমক করছে চারদিক। মনটা খুশিতে নেচে উঠল হ্যারিসের। দ্রুত লতাপাতা সরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন আরও সামনের দিকে।

পুকুরের তীর ঘেঁষে দাঁড়ালেন হ্যারিস। পুকুরটা গভীর বেশ। ফার্ন আর আঙুর লতায় ছাওয়া জলাধারটি ডুবে আছে ধূসর টিলার ভেতরে। পরিষ্কার ঝকমকে পানি, দুলতে দুলতে বয়ে যাচ্ছে অনেক দূরের এক জলপ্রপাতের প্রান্তে। অসাধারণ চোখজুড়ানো দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখলেন হ্যারিস। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এদিকটায় কেউ আসেনি খুব একটা, অক্ষতই থেকে গেছে এটি। হয়তো এই অ্যাস্টারয়েডের জন্মলগ্ন থেকে এখনো তার কৌমার্য ধরে রেখেছে এটি। তিনিই কি প্রথম দেখলেন? এ রকম একটা ভাবনাও চকিতে খেলে গেল হ্যারিসের মাথায়। ঝোপঝাড়ে এমন আড়াল করা জায়গাটা, এ কারণেই ভাবনটা এল তাঁর মাথায়। আর এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত বোধও সঞ্চারিত হলো তাঁর মধ্যে। মনে হতে লাগল, তিনিই বুঝি এই পুকুরের মালিক। ফার্নের আড়াল ছেড়ে জলের দিকে একটুখানি নামলেন হ্যারিস।

আর তখনই মেয়েটার দিকে চোখ পড়ল তার।

পুকুরের এক কোণে বসেছিল মেয়েটি। তাকিয়েছিল পুকুরের দিকে একদৃষ্টে। ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে। সম্ভবত গোসল করছিল মেয়েটি। হ্যারিসকে দেখেনি মেয়েটা। থামলেন তিনি। দম বন্ধ করে মেয়েটাকে দেখলেন কিছুক্ষণ।

সুন্দর, খুবই সুন্দর দেখতে। দীঘল কালো চুল ছড়িয়ে আছে তার কাঁধে–বাহুতে। হালকা–পাতলা গড়ন। দেহের কমনীয়তায় মুগ্ধ হ্যারিস স্থান-কাল ভুলে তাকিয়ে রইলেন মেয়েটির দিকে। মেয়েটি একেবারে চুপচাপ। নড়ছে না। একভাবেই তাকিয়ে আছে মুখ নিচু করে পুকুরের জলে। কোথা দিয়ে কত সময় যে বয়ে গেল, কে তার হিসাব রাখে! কিংবা সময় যেন থমকে গেছে হঠাৎ করে। ওই মেয়ে, হ্যারিস আর পুকুর, ফার্নের জঙ্গল—সব যেন চিত্রার্পিত হয়ে থাকল এই স্থির সময়ে।

হঠাৎ মুখ তুলল মেয়েটি। স্যাঁত করে পেছনে সরে গেলেন হ্যারিস। সচেতন হলেন নিজের অবস্থান নিয়ে। বুঝতে পারলেন মেয়েটি তাঁকে দেখেছে। এগিয়ে গেলেন তিনি। বললেন, আই অ্যাম সরি। আমি গ্যারিসন থেকে এসেছি। মানে এখানে এভাবে এসে পড়ব, ভাবিনি।

কোনো কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি।

‘তুমি কিছু মনে করোনি?’ জিজ্ঞেস করল হ্যারিস।

‘না।’

টেরান ভাষা! টেরান ভাষায় কথা বলল মেয়েটি। পাড় ধরে সাবধানে মেয়েটির দিকে এবার একটু এগিয়ে গেলেন হ্যারিস। ‘আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না। একটু বিরক্ত করছি। এই অ্যাস্টারয়েডে আমি বেশিক্ষণ থাকব না। এবারই প্রথম এসেছি। আজকেই প্রথম দিন। টেরা থেকে এসেছি।’

মেয়েটা হাসল ম্রিয়মাণ।

‘আমি একজন ডাক্তার। হেনরি হ্যারিস।’ মেয়েটির দিকে তাকাল সে একবার। ‘তোমার নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করছে, এখানে কেন এসেছি?’ বলে একটু থামলেন। ‘আমার মনে হয়, যে জন্য এসেছি, সে কাজে তুমি আমাকে সাহায্যও করতে পারবে।’

‘ওহ।’ মুখটা গোল করে বলল মেয়েটি।

‘তুমি কি সাহায্য করবে আমায়?’

হাসল মেয়েটি, ‘কেন নয়?’

‘তাহলে তো খুব ভালো। এখানে কি একটু বসতে পারি?’ আশপাশ দেখে একটা পাথর বেছে নিলেন হ্যারিস।

মেয়েটির মুখোমুখি হয়ে ধীরে ধীরে বসলেন। ‘সিগারেট?’

‘না।’

‘আমি একটা ধরাই।’ বলে অনুমতির ধার না ধেরে একটা শলাকা জ্বালিয়ে নিলেন। লম্বা করে শ্বাস নিয়ে মুখ খুললেন, ‘হয়েছে কি, আমাদের গ্যারিসনে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিছু মানুষের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে এবং এটা সংক্রামক আকারে ছড়িয়ে পড়ছে। এর কারণ খুঁজে বের করতে না পারলে আমরা খুব ঝামেলায় পড়ে যাব। গ্যারিসনটা চালাতে পারব না।’

কথাটা বলে এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন হ্যারিস। মেয়েটা সামান্য মাথা ঝাঁকাল। কী চুপচাপ মেয়ে রে বাবা, ভাবলেন হ্যারিস। চুপচাপ। নড়ে না চড়ে না। একঠায় বসে আছে তো আছে। যেন একটা ফার্ন।

আরেকবার ওকে ভালো করে দেখলেন হ্যারিস। কী সুন্দর! ঘাড়টা ঘুরিয়ে পেছন ফিরে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মরাল গ্রিবা বুঝি একেই বলে।

‘আচ্ছা আমি কী পেয়েছি, সেটা তোমাকে জানাই আগে। ওদের সঙ্গে কথা বলে কয়েকটা বিষয় আমি জানতে পেরেছি। এর মধ্যে একটা খুব মজার তথ্য। ওরা সবাই বলছে যে ওদের এই অবস্থার কারণ হলো পাইপাররা। ওরা বলে যে পাইপাররাই ওদের শিখিয়েছে...।’ বলতে বলতে থেমে গেলেন হ্যারিস। মেয়েটার ছোট্ট মুখে অদ্ভুত এক চাহনি দেখে থমকে গেলেন তিনি। ‘তুমি কি পাইপারদের চেনো?’

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি।

আনন্দে নেচে উঠল হ্যারিসের মন। ‘সত্যিই চেনো? আমি অবশ্য জানতাম এখানকার স্থানীয়রা এদের ব্যাপারে জানবেই।’ উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। ‘আমি জানতাম। আমি ঠিকই জানতাম, পাইপার বলে যদি কেউ থাকে, তাহলে তোমরা জানবেই। তার মানে, সত্যি সত্যি পাইপাররা আছে?’

‘আছে।’

ভ্রুতে সামান্য ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞেস করলেন হ্যারিস, ‘আর ওরা এই অরণ্যের মধ্যেই আছে, তাই না?’

‘হ্যাঁ।’

‘আই সি।’ অস্থিরভাবে হাতের সিগারেটটা পাথরের গায়ে চেপে ধরে নিভিয়ে দিলেন হ্যারিস। ‘তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ওদের কারও কাছে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই না?’

‘নিয়ে যাব মানে?’

‘হ্যাঁ। সমস্যাটা আমার এবং আমাকেই এটার সমাধান করতে হবে। শোনো, টেরার বেস কমান্ডার আমাকে এই সমস্যাটা সমাধানের দায়িত্ব দিয়েছেন। এই যে পাইপারদের কারণে যা হচ্ছে, সেটার সমাধান করা। এটার সমাধান করতেই হবে। সুতরাং ওদের খুঁজে বের করা আমার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, বুঝতে পারছ?’

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। সে বুঝেছে।

‘ঠিক আছে। তুমি কি আমাকে ওদের কাছে নিয়ে যাবে?’

চুপ করে রইল মেয়েটি। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে তাকিয়ে রইল পুকুরের পানির দিকে। সেই একই ভঙ্গিতে, থুতনিটা হাঁটুর ওপরে রেখে। অধৈর্য হয়ে উঠলেন হ্যারিস। সামনে–পেছনে হাত দুটো ছোড়াছুড়ি করলেন বারদুয়েক। এক পায়ের ওপর থেকে শরীরের ভর চাপালেন আরেক পায়ে।

‘আচ্ছা, তুমি কি হেল্প করবে না?’ আবার জানতে চাইলেন হ্যারিস। ‘পুরো গ্যারিসনের জন্য বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তুমি একটা কিছু বলো? এভাবে চুপ করে থেকো না।’ বলতে বলতে পকেটে হাত ঢোকালেন হ্যারিস। ‘তুমি যদি সাহায্য করো, তাহলে বিনিময়ে তুমিও কিছু পাবে। আমার কাছে আছে...বলতে বলতে পকেট থেকে লাইটারটা বের করে দেখালেন, ‘এটা তুমি পেতে পারো। খুব দামি লাইটার।’

এবার মেয়েটা দাঁড়াল, ধীরে ধীরে, মার্জিত ভঙ্গিতে, অনেকটা নৃত্যের মুদ্রায়। দেখে মনে হলো না দাঁড়ানোর জন্য কোনো রকম চেষ্টা করতে হয়েছে তাকে। এমন নমনীয় তার দেহ, যেন একটি মাত্র চলনে সে পায়ের ওপর ভেসে উঠল। দেখে মুখটা হাঁ হয়ে গেল হ্যারিসের। চোখ পিট পিট করল সে। বিনা চেষ্টাতেই এভাবে দাঁড়ানো যায়! এইমাত্র বসেছিল সে, পরমুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে হ্যারিসের দিকে শান্ত দৃষ্টি মেলে। মুখ ভাবলেশহীন। চকিতে একবার স্যানাটোরিয়ামের পাশে নদীতীরে ওয়েস্টারবার্গের দাঁড়ানোর দৃশ্য উঁকি দিয়ে গেল হ্যারিসের স্মৃতিতে।

মেয়েটা এখনই চলে যাবে। ও কি তাকে নিয়ে যাবে না পাইপারদের কাছে? মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, ‘কি হেল্প করবে?’

‘হ্যাঁ করব। আমার সঙ্গে আসো।’ বলে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। হাঁটতে লাগল ফার্নের সারির দিকে।

দ্রুত তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন হ্যারিস। ‘ওহ! নাইস।’ বললেন খুশি মনে। ‘তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই পাইপারদের সঙ্গে দেখা করার জন্য মুখিয়ে আছি, বুঝলে...!’ গড়গড় করে কথা বলতে লাগলেন হ্যারিস। আনন্দে অস্থির অবস্থা তাঁর। এত সহজে সবকিছু হয়ে যাবে, ভাবেননি তিনি। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর বকবকানি থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আচ্ছা, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ, বলো তো? তোমার গ্রামে? রাত নামার আগে কি আমি ফিরতে পারব?’

কোনো কথারই জবাব দিল না মেয়েটি। এরই মধ্যে ফার্নের জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে সে। দ্রুতপদে ওকে অনসুরণ করছেন হ্যারিস, যেন হারিয়ে না যায়। মেয়েটা তো হাঁটছে না, যেন উড়ছে, উড়ে উড়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ল হ্যারিসের জন্য।

‘একটু দাঁড়াও।’ বললেন তিনি। ‘আরে, আমি তো পিছিয়ে পড়ছি। একটু আস্তে যাও না!’

মেয়েটা থামল। অপেক্ষা করল হ্যারিসের জন্য। আরেকবার ওকে ভালো করে দেখলেন হ্যারিস। কী সুন্দর! ঘাড়টা ঘুরিয়ে পেছন ফিরে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মরাল গ্রীবা বুঝি একেই বলে।

ফার্নের অরণ্যে হারিয়ে গেলেন হ্যারিসও।

১১

‘আরে, আমার তো পুড়ে মরার দশা।’ চেঁচিয়ে উঠলেন কমান্ডার কক্স। ছোট্ট নভোযানটা থেকে নেমে হেঁটে আসছিলেন হ্যারিস। প্রচণ্ড রোদ। কক্স দাঁড়িয়েছিলেন পোর্টের কাছেই, হ্যারিসের অপেক্ষায়। তিনিও কয়েক পা এগোলেন। হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। ‘আপনার নিশ্চয়ই খুব বেশি সময় লাগেনি।’

একটা দেঁতো হাসি দিয়ে ভারী স্যুটকেসগুলো নিচে নামিয়ে হাত মেলালেন হ্যারিস। একটু দম নিয়ে বললেন, ‘এর কোনো মানে হয় না। এত লোড আমি নিতে পারব না।’

‘আগে ভেতরে চলুন তো।’ ডান দিকে তাকালেন কক্স, ‘সোলজার, এগুলো নিয়ে যাও।’

একজন সোলজার এসে হ্যারিসের বাক্স–প্যাটরা নিয়ে রওনা দিল হ্যারিসের কোয়ার্টারের দিকে। পোর্টের কাছেই হ্যারিসের নিবাস।

তিনজনে এসে দাঁড়াল ওর ঘরের সামনে। বাক্স–প্যাটরা রেখে বিদায় হলো সৈন্যটি।

‘থ্যাংকস। অল্প সময়ের জন্য হলেও ফিরে এসে ভালো লাগছে।’ মুখ খুললেন হ্যারিস।

‘অল্প সময়ের জন্য মানে?’

‘আমি আসলে আমার দায়দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এসেছি। কাল ভোরেই আমাকে ওয়াই থ্রিতে ফিরে যেতে হবে।’

‘তার মানে, তুমি সমস্যার কোনো সুরাহা করতে পারোনি?’

‘না, তা নয়। আমি ধরতে পেরেছি, সমস্যাটা কোথায়। কিন্তু ওটা সারাতে পারিনি। আমাকে এখন ফিরে যেতে হবে। অনেক কাজ বাকি আছে।’

‘তার মানে তুমি ধরতে পেরেছ, ঘটনাটা কী?’

‘হ্যাঁ। ওরা যা বলেছে এটা তা-ই। পাইপারস।’

‘পাইপাররা সত্যিই আছে?’

‘হ্যাঁ।’ মাথা ঝাঁকালেন হ্যারিস। ‘ওরা আছে।’ গা থেকে কোটটা খুলে চেয়ারে ঝুলিয়ে রাখলেন হ্যারিস। জানালার কাছে গিয়ে নামিয়ে দিলেন পাল্লা। বসন্তের উষ্ণ হাওয়ায় ভরে গেল ঘরটা মুহূর্তেই। বিছানায় হেলান দিয়ে বসলেন তিনি।

‘পাইপাররা আছে, কিন্তু সেটা গ্যারিসন ক্রুদের মনের মধ্যে। ক্রুদের কাছে পাইপাররা বাস্তব। ক্রুরাই ওদের তৈরি করেছে। এটাকে বলতে পারেন একটা মাসহিপনোসিস, একটা গ্রুপ প্রজেকশন। ওখানকার সবার মনেই কমবেশি এই ধারণাটা আছে।’

‘এটা শুরু হলো কীভাবে?’

‘ওয়াই থ্রির ওই মানুষগুলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, ব্যতিক্রমী কিছু দক্ষতাও ছিল ওদের। সারাটা জীবন ওরা আধুনিক সমাজের এক জটিল স্কুলিংয়ের ভেতর কাটিয়েছে। সারাক্ষণ একটা লক্ষ্য পূরণের চাপ ছিল ওদের ওপর। একটা কিছু করতে হবে। একটা কিছু করে দেখাতে হবে। এই উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটেছে সারাক্ষণ।’

‘এ অবস্থা কমবেশি সবার মধ্যেই থাকে, তা–ই না?’

‘তা থাকে। কিন্তু সবাই তো আর ওয়াই থ্রিতে চাকরি করে না। দেখুন, হঠাৎ করে ওদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো এমন একটা অ্যাস্টারয়েডে, যেখানে স্থানীয়রা আদিম জীবন যাপন করছে। একেবারে নিরামিষ জীবন যাদের। ওদের কোনো গোল নেই। জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না। কোনো পরিকল্পনা করার সামর্থ্যও নেই ওদের। প্রাণীদের মতোই জীবন কাটায় ওরা। দিন আনে দিন খায়। ঘুমায়, গাছ থেকে ফল পেড়ে খায়। একেবারে যাকে বলে স্বর্গোদ্যান। কোনো বিরোধ নেই, বিবাদ নেই।’

‘তো...?’

‘গ্যারিসনের সব ক্রুরাই ওদের জীবনযাত্রা দেখেছে। আর অবচেতনভাবে নিজেদের কাটিয়ে দেওয়া জীবনের কথা ভেবেছে। যখন সে শিশু ছিল, কোনো ভাবনা ছিল না, উদ্বেগ ছিল না, দায়দায়িত্ব ছিল না। সবকিছুরই সূত্রপাত হয়েছে আধুনিক জীবনে প্রবেশের পর। তার আগে পর্যন্ত সে ছিল উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে লুটোপুটি খাওয়া এক শিশুর মতো।’

‘তো...?’

‘নিজের মনেই এটা মানতে পারছিল না ওরা। ওদের মনে হচ্ছিল, আমিও তো নেটিভদের মতো জীবন কাটাতে পারি। ওদের মতোই সারা দিন শুয়ে–বসে দিন কাটাতে পারি। কী দরকার এত হুজ্জতের। সুতরাং ওরা আবিষ্কার করল পাইপারদের। বলতে লাগল, গভীর বনের এই পাইপাররাই ওদের ফাঁদে ফেলে ওদের মতো জীবন কাটানোর কথা বলে ওদের। এর ফলে পাইপারদের অসিলা দিয়ে নিজেদের মতো জীবনটা কাটাতে পারে ওরা। ওরা বলে যে পাইপাররা ওদের অরণ্যের অংশ হয়ে ওঠার কথা বলে, শিক্ষা দেয়।’

‘তো এখন আপনি কী করবেন?’

‘সেটাই ভাবছি।’

‘পুরো বনটা জ্বালিয়ে দিলে কেমন হয়?’

‘না।’ চমকে উঠলেন হ্যারিস। মাথা নাড়লেন। ‘এটা কোনো সমাধান নয়। অরণ্য তো কোনো ক্ষতি করেনি। আসলে ওদের দরকার সাইকোথেরাপি। এ কারণেই আমি ফিরে যাচ্ছি। গিয়ে আমি এ জন্য কাজ শুরু করব। ওদের বোঝাতে হবে যে পাইপাররা আসলে নেই বা থাকলেও সেটা শুধু ওদের মনের মধ্যেই আছে। অরণ্য তো নিষ্পাপ। আর ওই নেটিভদের কিছু শেখানোর কোনো ক্ষমতা নেই। আদিম মানুষ ওরা, নিজেদের লিখিত ভাষাও নেই।’

কিছুক্ষণ চুপচাপ। কেউ কোনো কথা বললেন না।

‘আই সি।’ একটু দেরি করেই মুখ খুললেন কক্স। ‘আপনার কথায় যুক্তি আছে।’ উঠে দাঁড়ালেন কমান্ডার। ‘আশা করি যখন ফিরে আসবেন, ওই সব পাগলদের জন্য একটা দাওয়াই নিয়ে আসবেন।’

‘আমারও তাই আশা।’ বলল হ্যারিস। ‘আমার মনে হয় আমি পারব। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ওদের মধ্যে আত্মসচেতনতা বাড়াতে হবে। এটা করতে পারলেই মনের মধ্যে পাইপাররা ভ্যানিশ হয়ে যাবে।’

মাথা ঝাঁকালেন কক্স। ‘তাহলে আর বাক্স–প্যাটরা খোলার দরকার নেই। কাল সকালেই রওনা দেন।’

‘ফাইন।’

১২

দরজাটা খুললেন হ্যারিস। কমান্ডার বেরিয়ে গেলেন হলরুমের দিকে। আস্তে করে দরজাটা ভিড়িয়ে দিলেন হ্যারিস। ঘরটা পুরো হেঁটে গেলেন জানালার দিকে। পকেটে হাত দিয়ে বাইরের পানে তাকালেন।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাতাস ঠান্ডা হয়ে উঠছে। ওর চোখের সামনেই দালানগুলোর পেছনে অস্ত গেল সূর্য।

জানালার কাছ থেকে স্যুটকেসের কাছে এসে দাঁড়ালেন হ্যারিস। ভীষণ ক্লান্ত তিনি। এক গভীর ক্লান্তি নেমে এসেছে তাঁর সর্বাঙ্গজুড়ে। এত এত কাজ বাকি এখনো। এত কাজ একা কীভাবে করবেন? অ্যাস্টারয়েডে ফিরে যাবেন। তারপর?

একটা লম্বা হাই তুললেন হ্যারিস। চোখ বুজে এল। এত ঘুম জমে ছিল ওর শরীরে! বিছানার দিকে একবার তাকালেন। বসে পড়লেন ওটার এক কোণে। জুতা জোড়া খুলে ফেললেন পা থেকে। এত এত কাজ আগামীকাল, ভাবলেন আরেকবার।

ঘরের এক কোণে গিয়ে জুতা জোড়া রাখলেন। এরপর ঝুঁকে পড়ে খুলে ফেললেন একটা স্যুটকেস। ভেতর থেকে বের করলেন ফাপা চটের বস্তা। বস্তার ভেতর থেকে একটু একটু করে মেঝের ওপর রাখতে লাগলেন মাটি। আলগা নরম মাটি। গত ঘণ্টা তিনেক এই মাটিই তিনি সংগ্রহ করেছেন ওয়াই থ্রিতে, জড়ো করেছেন বস্তায়, ভরেছেন স্যুটকেসে।

এখন সেগুলোই বিছিয়ে দিতে লাগলেন মেঝেজুড়ে। ছড়ানো শেষ হলে তার ঠিক মাঝখানে গিয়ে বসলেন হ্যারিস। দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন চিত হয়ে। যখন আরামে ভরে উঠল মনটা, তখন হাত দুটো ভাঁজ করে রাখলেন বুকের ওপর। চোখ জোড়া বন্ধ করলেন। এত এত কাজ বাকি, আরও একবার ভাবলেন তিনি। তবে তার জন্য সময় আছে। কাল করা যাবে।

ইশশ কী আরাম এই মাটির বিছানা!

ভাবতে ভাবতে মুহূর্তের মধ্যেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন হ্যারিস।